Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 57 – 64
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বিনয় মজুমদারের কাব্যকৃতি : অনির্বাণ আঘাতের উদ্বেজনা

নরেশচন্দ্র মজুমদার
ইমেইল : nareshchandramajumder76@gmail.com

Keyword
বিস্ময়-প্রতিভা, অনির্বাণ-আঘাত, উদ্বেজনা, নির্মুখোশ, অতিচেতনা, ঈশ্বরী।

Abstract
কবি বিনয় মজুমদার এক বিরল ব্যতিক্রমী বিস্ময়-প্রতিভার নাম। বহুচর্চিত না-হলেও, আধুনিক বাংলাকাব্যের সচেতন পাঠকবৃত্তে আদৌ অপরিচিতও নন। তাঁকে ঘিরে বিতর্কও নিরন্তর সক্রিয়। জীবনানন্দের শিষ্যস্বরূপ, দান্তের ছায়ামাখা বিনয় মজুমদার পঞ্চাশের দশকের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি। পঞ্চাশের দশক অতিক্রম করে, তথাকথিত আধুনিকতার উত্তর-সাধনায় নির্বিকার তপস্বীর তন্ময়তা তাঁর জীবনস্বভাবের স্বরলিপি; তাঁর সৃষ্টি কখনও উদ্ভট, কখনও পাগলামো বলে মনে হলেও জীবনানন্দ-শক্তি চাটুজ্যের পর বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি ব্যতিক্রমী স্তম্ভ-স্বরূপ। আধুনিকতার ঋদ্ধিময় প্রতিষ্ঠা থেকে আধুনিকতার ক্রমমুক্তিতে তাঁর সবিনয় যাপন 'ফিরে এসো চাকা' থেকে 'আমিই গণিতের শূন্য' পাঠকের অভ্যস্থ আলস্যময়তা কেমন যেন এলোমেলো করে দেয়। কিন্তু কেন এই কৃচ্ছ-সাধন? কোন অনির্বাণ আঘাতের উদ্বেজনায় পলেপলে ক্ষণেক্ষণে আত্মক্ষরণ, আত্মসমর্পণ? লোভনীয় চাকরির নির্ভার আর্থিক-নিরাপত্তার মোহ ত্যাগ ক'রে নির্মুখোশ অকৃতদার যাপন 'কাহার তরে'? গায়ত্রী চক্রবর্তী, ঈশ্বরী না অন্যকোনো অতিচেতনার অস্তিত্বের সবিনয়ে বিনয়ের জীবন অন্বেষণ?

Discussion

"মর্ত্যলোকে বাসকালে এ-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হয়েছি —
অধিকাংশ কার্য আমি কী-এক অদ্ভুত রূপে সম্পাদন করি
অতিচেতনার দ্বারা হয়তো বা যাতে এই ঐশ্বরীক কার্যাবলী প্রায়
করি ব'লে বুঝিই না, করার সময় প্রায় বুঝি না যে করি।
অথচ সজ্ঞানকার্য এবং অজ্ঞানকার্য এ-দুয়ের যোগাযোগ বোঝা
মোটেই দুরূহ নয়— সহজেই লক্ষ্য করা যায়
এ-সকল কার্য আমি নিজেই করেছি, করি কী-এক অদ্ভুতরূপে যেন,
যেন অতিচেতনার অস্তিত্বের ফলে।"[১]

কবি বিনয় মজুমদার এক বিরল ব্যতিক্রমী বিস্ময়-প্রতিভার নাম। বহুচর্চিত না-হলেও, আধুনিক বাংলাকাব্যের সচেতন পাঠকবৃত্তে আদৌ অপরিচিতও নন। তাঁকে ঘিরে আজও বিতর্ক নিরন্তর সক্রিয়। 'ফিরে এসো চাকা'-র সেই সনিষ্ঠ শক্তিবান স্রষ্টা কেন লিখলেন বাল্মীকির কবিতা, আবার কেন লিখলেন এখন দ্বিতীয় শৈশবে সত্যিই কি তিনি কবিতা বোঝেননি? শেষ পর্বের অনেক কবিতায় কেন এত উদ্ভট মনে হয় তাঁর? কেন তিনি নিজেকে গণিতের শূন্যময়তায় জীবনের স্বরলিপি বাঁধলেন? কোন অবিশ্লেষ্য অনির্বাণ আঘাতের কাছে আত্মসমর্পণ করে এমন দেউলেপনায় জীবন-স্বভাবের স্বরলিপি নির্মাণ করলেন কবি? এ কি নিছক কল্পনা না পাগলামো, না অজ্ঞাত কোনো রক্তবাহিত প্রবণতা, না অতিচেতনার অস্তিত্বের ফলশ্রুতি কবিকে বিপন্ন-বিস্ময়ের স্রোতধারায় বয়ে নিয়ে গেল? কী? এবং/অথবা কে? কবির সৃষ্টিসত্তাকে এমনভাবে উদ্বেজিত করলেন আজীবন!

জীবন যথা কাব্যস্বরূপ -

বিনয় মজুমদার জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ (৩১ ভাদ্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দে), রাত্রি ১২টা ৪৮ মিনিটে তৎকালীন বার্মা বর্তমান মায়ানমারের মিকাটিলা জেলার তেডোতে। বাবা বিপিনবিহারী মজুমদার, মা বিনোদিনী দেবী; যদিও তাঁদের পূর্বপুরুষের প্রকৃত পদবী মজুমদার ছিল না। তাঁর বাবার সময় থেকেই সরকারি কাগজে মজুমদার পদবী দেখা যায়, তাঁর ঠাকুরদা নিমচাঁদ সম্ভবত মজুমদার পদবী ব্যবহার করেননি। বিনয় মজুমদারের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় অধ্যাপক উত্তম বিশ্বাসের সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায় যায়, তাঁদের পূর্বপুরুষের প্রকৃত পদবী ছিল মৃধা।[২] রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের কারণে বার্মা ছেড়ে মাত্র আট বছর বয়সে বিনয় মজুমদার পরিবারের সাথে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার মুকসুদপুর বা টেংরাখোলা থানার তারাইল গ্রামে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। বিনয়ের শৈশব কেটেছে অংশত তৎকালীন বার্মায় এবং বেশিটা পূর্ববঙ্গে। স্বাধীনতার পরে পরে ১৯৪৮ সালে বিনয়ের পিতৃদেব বিপিনবিহারী বাবু পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ঠাকুরনগরের শিমুলপুর গ্রামে বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

কৃতি শিক্ষার্থী বিনয়ের শিক্ষা শুরু হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার বৌলতলি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন বিনয়। এই স্কুলের অ্যানুয়াল ম্যাগাজিনে ১৯৪৭ সালে বিনয়ের প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। পরে পরিবারের সাথে পশ্চিমবঙ্গে এসে কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সুনামের সাথে আই. এস-সি উত্তীর্ন হন। এর পর হাওড়া, শিবপুর বি. ই. কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন। তাঁর বিষয় ছিল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়াইং। বি. ই. কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালা ১ম শ্রেণিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। তিনিই ছিলেন বি. ই. কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। তাঁর সম্পাদনাতে 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যানুয়াল সিলভার জুবিলি নাম্বার' প্রকাশিত হয়।

'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, কৈশোর থেকেই কবিতা লিখতেন বিনয় মজুমদার। প্রথম কবিতা লেখেন মাত্র তেরো বছর বয়সে। স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে কবিতা লেখার সংখ্যা বাড়ে এবং কিছুটা নিয়মিত লিখতে থাকেন। একটি মোটা ডাবল ক্রাউন সাইজের চামড়ায় বাঁধানো খাতাতে লিখে রাখতেন সব। কিন্তু ছাপতেন না। কেউ তাঁর কবিতার প্রসঙ্গ তুললেই লজ্জা পেতেন। হোস্টেলে থাকতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতা লেখার কথা পাঁচ-কান হতে দেরি হয় না। তবে কলেজের দেয়ালপত্রিকা বা মুদ্রিত বার্ষিক পত্রিকাতেও ছাত্র বিনয়ের কোনো কবিতা কখনও প্রকাশিত হয়নি।

১৯৫৭ সালে বিনয়ের কলেজে পড়া শেষ হয়। বিনয় হাওড়া থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন আবার। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তিনি প্রথম চাকরি নেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এ।

কিছুদিনের মধ্যে তিনি এই চাকরি ছেড়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর ডেভেলাপমেণত ইঞ্জিনিয়ার পদে যোগ দেন। কিন্তু এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে তিনি দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। তবে এই চতুর্থ এবং শেষবারের চাকরিও তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেন। চাকরি ছেড়ে দেন নিরঙ্কুশ কবিতা চর্চা করবেন বলে।

বিনয়ের তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে ১৯৫৮ সালে *নক্ষত্রের আলোয়* শীর্ষক প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় ১লা আশ্বিন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক দেবকুমার বসু। তাঁর প্রকাশন সংস্থা গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা–১২; প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন দেবুদা অর্থাৎ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বইটি বিনয় নিজের ব্যয়েই ছাপিয়েছিলেন। দাম ছিল ১টাকা। এই কাব্যগ্রন্থে কোনো উৎসর্গপত্র ছিল না এবং পরেও এই গ্রন্থের আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

বি. ই. কলেজে পড়ার সময়েই খুব যত্নের সঙ্গে রুশ ভাষা শিখেছিলেন বিনয়। রুশ ভাষা থেকে বহু গল্প ও কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিনয়। পাঁচটি রুশ ভাষার বই-ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। 'ফিরে এসো চাকা', 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা', 'বাল্মীকির কবিতা', 'এক পংক্তির কবিতা', 'আমিই গণিতের শূন্য', 'দ্বিতীয় শৈশব', 'কবিতা বুঝিনি আমি' ইত্যাদি ব্যতিক্রমী ধারার কাব্য-কবিতা চর্চা ছাড়াও কিছু গদ্য রচনাও করেছেন। 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' শীর্ষক কাব্যতত্ত্বের ওপর লেখাটি গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক রচনা।

কবিতা চর্চার পাশাপাশি গণিতশাস্ত্রের চর্চাও করেছেন। গাণিতিক তত্ত্বভিত্তিক তিনটি বইও রচনা করেছেন। গণিতশাস্ত্রের ইন্টার্পোলেশন সিরিজ (Interpolation Series), জিওমেট্রিক্যাল অ্যানালাইসিস্ অ্যান্ড ইউনিটাল অ্যানালাইসিস্ (Geomatrical Analysis and Unital Analysis), এবং রুটস অব্ ক্যালকুলাস্ (Roots of Calculus) — অপ্রকাশিত এই বইগুলি টাইপ-করা কপি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

অকৃতদার কবির একলা-যাপন, শেষ-যাপন ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুরনগরের শিমুলপুর গ্রামের পৈতৃক-নিবাসে। ১৯৬৭ সাল নাগাদ একবার বিনা পাসপোর্টে সীমান্ত পেরিয়ে পূর্বপাকিস্তানে চলে যান এবং নিজেই পুলিশ স্টেশনে গিয়ে স্বীকার করেন অপরাধের কথা। ফলত, বিচারাধীন বন্দী হিসাবে পূর্বপাকিস্তানের জেলে ৬ মাস আটক থাকতে হয়। একবার ধর্ম বদলে মুসলমান হতে চাওয়ার কথাও বলেন। জটিল মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে গুরুতর অসুস্থ হলে সরকারী ব্যবস্থাপনায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এজরা ওয়ার্ডের ১৯ নং বেডে তাঁকে ভর্তি করা হয়। ১৯৮৮ সালে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে আবার তাঁকে কলকাতা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। ১১ ডিসেম্বর, ২০০৬ সালে কবির জীবনাবসান ঘটে।

'কবি হয়ে-ওঠা' স্বগত-ভাষ্য –

বিনয় মজুমদারের কবি 'হয়ে-ওঠা'র আত্ম-বৃত্তান্ত চমৎকার ধরা পড়েছে তাঁর 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব' এবং 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টিতে। কবির কথা স্বভাবত স্বকৃত-কলমে যে-ভাবে ধরা পড়ে, তা অন্যের কলমে পাওয়া সম্ভব নয়। অকপট স্বীকারোক্তিতে কবির স্বগতোচ্চারণ প্রকৃত সৃষ্টির সমতুল বা অন্য সৃষ্টি। আর তা নিজের কবিকৃতি বিষয়ে হলে তো কথাই নেই। বিনয় মজুমদারের মতো সৃষ্টি-সমাহিত কবি যখন নিজের 'কবি-হয়ে ওঠা'র কথা বলেন নিজস্ব অক্ষরে, তখন তা গবেষকের কাছে আকর উপাদান হয়ে ওঠে। আমরা এখানে কবি বিনয় মজুমদারে আত্ম-ভাষ্য থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি উদ্ধার করে তাঁর কবিতা-বলয়ে আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটটি ধরার চেষ্টা করেছি। পরিণত প্রজ্ঞায় কবি লিখেছেন –

"কৈশোর থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করি। প্রথম কবিতা যখন লিখি তখন আমার বয়স তেরো বছর। ...স্কুলে কবিতা লিখতাম ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু কলেজে উঠে নিয়মিত কবিতা লিখতে শুরু করি। লিখতাম বেশ গোপনে গোপনে, যাতে কেউ টের না-পায়। কারণ আমি কবিতা লিখি—এ-কথা কেউ বললে খুব লজ্জা হতো আমার। কলেজের হোস্টেলে থাকতাম। ফলে অন্য আবসিকরা শীঘ্রই জেনে ফেলল যে আমি কবিতা লিখি। কলেজে একটি দেওয়াল পত্রিকা ছিলো। খুব সুন্দর হাতের লেখায় শোভিত হয়ে পত্রিকাটি নিয়মিত বেরতো। ...আমার লেখা কবিতা কিন্তু কখনো এ-দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। কলেজের একটি ছাপা বার্ষিক সাহিত্য সঙ্কলনও ছিলো। তাতেও আমার কবিতা কখনো প্রকাশিত হয়নি। সেই সময় আমার সব কবিতায় মিল থাকতো। মিলগুলি অনায়াসে মন থেকে বেরিয়া আসতো। তার জন্য একটুও ভাবতে হতো না। কবিতা যখন লিখতাম মনে হতো আগে থেকে মুখস্থ করা কবিতা লিখে যাচ্ছি, এত দ্রুত গতিতে লিখতে পারতাম। এক পয়ার ভিন্ন অন্য সব ছন্দেই লিখতাম। কবিতাগুলির বিষয়বস্তুও ছিল বিচিত্র, প্রায় সবই কাল্পনিক। দু-একটা বিষয়বস্তুর অংশ আমার এখনো মনে আছে— চিল্কা হ্রদের ধারে এক সঙ্গিনীসহ ব'সে ব'সে চারিপাশে নিসর্গকে দেখছি বা এক সঙ্গিনীসহ মোটরগাড়িতে ক'রে খুব দ্রুতবেগে চলেছি, মনে হচ্ছে গাড়িটি পৃথিবীর একটি উপগ্রহবিশেষ বা ট্রেনে ক'রে দৈনিক লক্ষ লক্ষ কেরানি কী-ভাবে চাকুরি করতে কলকাতায় আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময়ে লেখা কবিতাগুলি দীর্ঘ হতো। ছোটো কবিতা আমি প্রায় লিখতে পারতাম না।

যাই হোক, ইংরেজি ক্ল্যাসিক্যাল কবিদের বই আমি প্রায়শই লাইব্রেরি থেকে এনে পড়তাম। সেই বয়সে তাঁদের কবিতা আমার ততো ভাল লাগতো না। আমার মনে হচ্ছে বয়স কম বলে এমন হতো — একথা বোধহয় ঠিক লিখিনি। কারণ তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে আমার ভালো লেগেছিল 'প্রান্তিক' নামক ছোটো বইখানি। এখনো আমার ঐ বইখানিই সবচেয়ে ভালো লাগে। বয়স বাড়ার ফলে আমার সে অল্প বয়সের ভাললাগা পাল্টায়নি। যা হোক, কবিতা লেখার অন্যতম প্রধান ব্যাপার হচ্ছে একটি ভালো বিষয়বস্তু মনে আসা। তখনকার বিষয়বস্তু ছিলো অধিকাংশ কাল্পনিক — একথা আগেই লিখেছি। শহরের দৃশ্যাবলী—পথ-ঘাট-মাঠ-বাড়ি — এ সকল আমার কবিতার বিষয়বস্তুতে আসতো না। মাঝে মাঝে গ্রামে আসতাম। গ্রামের দৃশ্যাবলীও আমার বিষয়বস্তু হতো না। অর্থাৎ কেবল বর্ণনামূলক কবিতা আমি সেই বয়সেই লিখতে পারতাম না। এতদিন পরে এখন কিছু কিছু লিখতে পারি। ... এক পয়ার বাদ দিয়ে অন্য সকল ছন্দে আমি অনায়াসে লিখতাম। মিল দিতে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। মিল যেন এমনিই এসে যেতো। এই কলেজে আসার পর আমি পয়ারে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্ভুল পয়ার আমি একবারও লিখতে পারতাম না। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটি স্পষ্ট টের পেতাম। কিন্তু সে-ভুল শোধরাবার কোনো উপায় খুঁজে পেতাম না। তখন থেকে শুরু করে চার বছর লেগেছিল আমার পয়ার লেখা শিখতে— 'আবিষ্কার করতে' ... এবং ১৯৬০ সালের শুরুতে আমি পয়ারে লেখার নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কার করি। তারপর পয়ার ভিন্ন অন্য কোনো ছন্দ লিখিইনি। এখন পয়ারই আমার প্রিয়তম ছন্দ। শুধু পয়ারেই লিখি।

... এই কলেজে পাঠকালে লেখা কবিতায় কাটাকুটি আবির্ভূত হয়। আগে কাটাকুটি করার বিশেষ দরকার হতো না। এবার দরকার হতে লাগলো। কবিতায় অলঙ্কার বলতে আগে দিতাম শুধু উপমা। এবার কবিতায় উপমার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতীকও ব্যবহার করতে লাগলাম। সে-সময়কার কবিতার খাতাগুলি আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ কলেজে চার বছরব্যাপী পড়ার সময় আমি গোটা পঞ্চাশ কবিতা লিখেছিলাম। শুধু যে সময়াভাব এর জন্য দায়ী তা নয়, কাব্যিক বিষয়বস্তুর অভাবও এর জন্য দায়ী। অনেক পরে আমি যে-কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লেখার পদ্ধতি আমি আবিষ্কার করি। অনেক পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমার বইয়ের এক সমালোচনায় লিখেছিলো যে আমি যে-কোনো বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে পারি, এমন কি 'গু গোবর' নিয়েও আমি সার্থক কবিতা লিখতে পারি। কিন্তু তখনো অবস্থা এমন হয়নি। সেই কলেজে পাঠকালে ভাবতাম কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক, আর কিছু বিষয় বস্তু কাব্যিক নয়। এখন আমার মনে হয় ব্যাপারটা তেমন নয়। সব বিষয়বস্তুই কাব্যিক এবং যার দৃষ্টিতে এই কাব্যিকতা ধরা পড়ে,

তিনিই কবি। এমন কি, চিন্তা করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যে-পদ্ধতিতে ভাবলে কাব্যিকতা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্যিকতা লুকিয়ে থাকে, তাকে বের করার জন্য চিন্তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এ-সব কথা আমি টের পাই, বুঝতে পারি ১৯৬০ খৃস্টাব্দের গোড়া থেকে। তার আগে জানতাম না।"[৩]

এমনই সৃজনতায় সৃষ্ট কবির একে একে কাব্যগ্রন্থ। এক সময় জীবন আর কাব্য হয়ে ওঠে ভেদহীন; সমাহিত সাধকের ন্যায় কবিতাই হয়ে ওঠে কবি বিনয় মজুমদারের জীবনের সর্বস্ব এবং সর্বনাশ—সর্বনাশ এবং সর্বস্ব।

কাব্য যখন জীবনযাপন –

কবিতা কবির কল্পনা-লতা; কিন্তু কবিতা কেবল শব্দার্থের খেলা কিংবা ছন্দালঙ্কারের সৌখিন মজদুরি মাত্র নয়, নয় শ্রেষ্ঠ শব্দের শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসও; প্রকৃত কবিতা কবির স্বগতোচ্চারণ— বলা ভালো, স্বগত সত্যোচ্চারণ। যথার্থ কবির জীবন ও কবিতায় প্রকৃতার্থে কোনো ভিন্নতা থাকে না; জীবনই কবিতা হয়ে ওঠে এবং কবিতাই জীবন হয়ে যায়। বিনয় মজুমদার সেই কবি, যার জীবন ও কাব্যকে আলাদা করা যায় না।

এই সুযোগে বিনয় মজুমদারের কাব্য-সম্ভার একনজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে – 'নক্ষত্রের আলোয়' (১ আশ্বিন, ১৩৫৬/ ১৯৫৮); 'গায়ত্রীকে' (২৫ ফাল্গুন, ১৩৬৭ / মার্চ, ১৯৬১); 'ফিরে এসো চাকা' (১৯৬২); 'আমার ঈশ্বরীকে' (১৯৬৪); 'ঈশ্বরীর' (১৯৬৪) 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' (ভাদ্র, ১৩৭১/৩১ জুলাই, ১৯৬৫); 'অধিকন্তু' (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫/ ১৯৬৭); 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' (১৯৭৪); 'বাল্মীকির কবিতা' (শ্রাবণ, ১৩৮৩/১৯৭৬); 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৮১); 'আমাদের বাগানে' (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪); 'আমি এই সভায়' (১৯৮৪); 'এক পংক্তির কবিতা' (১৯৮৮); 'আমাকেও মনে রেখো' (১৯৯৫); 'আমিই গণিতের শূন্য' (১৯৯৬); 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে' (১৯৯৯) 'কবিতা বুঝিনি আমি' (২০০১)

উদ্ধৃত তালিকার সূচনা 'নক্ষত্রের আলোয়' আর শেষ 'কবিতা বুঝিনি আমি'। নক্ষত্রের আলো ছুঁয়ে যে মানুষটি 'ফিরে এসো চাকা'য় আধুনিক বাংলা কাব্য-দিগন্তের নক্ষত্র হয়ে উঠলেন, তিনিই অবশেষ বলে বসলেন 'কবিতা বুঝিনি আমি'। বিনয়ের একি নিছক বিনয়ী-বার্তা, নাকি অতিসংবেদনশীল কবির অন্তর্লীন অভিমান! কাব্যতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সকল রহস্যরস নিংড়ে নিয়ে কবিতায় আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন বিনয় মজুমদার। সরকারি চাকরি ছেড়ে, সকল আর্থিক নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে, নাগরিক জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানি ফুৎকারে উড়িয়ে কাব্যসাধনা করেছেন একান্তে। ভাব ভাষা ছন্দের বহুবিধ পরীক্ষা করতে করতেই একের-পর-এক কবিতা লিখে গেছেন একমনে। পাঠক জানেন, 'ফিরে এসো চাকা'র কবিতাগুলি; যেখানে ১২ সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন –

"সময়ের সঙ্গে এক বাজি ধ'রে পরাস্ত হয়েছি।
ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায়, স্বপ্নে বৃষ্টি হয়ে মাটিতে যেখানে
একদিন জল জমে, আকাশ বিম্বিত হয়ে আসে
সেখানে সত্বর দেখি, মশা জন্মে; অমল প্রত্যুষে
ঘুম ভেঙে দেখা যায়, আমাদের মুখের ভিতরে
স্বাদ ছিলো, তৃপ্তি ছিলো যে-সব আহার্য তারা প'চে
ইতিহাস সৃষ্টি করে; সুখ ক্রমে ব্যথা হয়ে ওঠে। ..."[৪]

[২৭ জুন ১৯৬১]

কোনো এক অনির্বাণ আঘাত কবি তাঁর ভিতরে আবিষ্কার করেছেন, সেই অনির্বাণ আঘাতের ব্যথা আর কবি আজীবন এড়াতে পারেননি। এই ব্যথার উৎস খুঁজতে পরিচিত প্রায়-সকলেই গায়ত্রী দেবীর কথা বলেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী ছিলেন সেই সময়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর পালিতা কন্যা। যাকে কিশোরী বয়সে স্যারের বাড়িতে কবি কবিতা সূত্রেই দু'এক বার প্রত্যক্ষ করেছিলেন মাত্র। মৃদু আলাপও হয়েছিল।

পরবর্তীতে অধ্যয়ন-সূত্রে বিদেশে পাড়ি দেন যুবতী গায়ত্রী। বিদেশেই বিবাহ করেন। অসামান্য প্রাণোচ্ছল সুন্দরী মেধাবী গায়ত্রীকে কবি ভুলতে পারেননি আজীবন। একপাক্ষিক প্লেটোনিক প্রেম কল্পনায় সর্বনাশা বাসা নির্মাণ করেছিল। ১৮ সংখ্যক কবিতায় কবি স্পষ্টত লিখছেন –

"বেশ কিছুকাল হলো চ'লে গেছো, প্লাবনের মতো
একবার এসো ফের; চতুর্দিকে সরস পাতার
মাঝে থাকা শিরীষের বিশুষ্ক ফলের মতো আমি
জীবনযাপন করি; কদাচিৎ কখনো পুরোনো
দেয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল রেখা থেকে কোনো
মানুষীর আকৃতির মতো তুমি দেখা দিয়েছিলে।
পালিত পায়রাদের হাঁটা, ওড়া, কূজনের মতো
তোমাকে বেসেছি ভালো, ..."[৫]

[১৯ জুলাই ১৯৬১]

এই দেখা হওয়া, এই চলে যাওয়া বাস্তব; প্রত্যাবর্তনের এই প্রত্যাশা অবাস্তব। ২০ সংখ্যক কবিতায় কবি আবারও যখন লেখেন–

"আর যদি না-ই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো না-ই মেশো,
সেও এক অভিজ্ঞতা, অগণন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো
তোমার অভাব বুঝি; ..."[৬]

[২০ জুলাই ১৯৬১]

কবির কল্পনায় বিরহবোধ আরও সুস্পষ্ট ৩২ সংখ্যক কবিতায় –

"কেন এই অবিশ্বাস, কেন আলোকিত অভিনয়?
কী আছে এমন বর্ণ, গন্ধময়; জীবনের পথে,
গ্রন্থের ভিতরে আমি বহুকাল গবেষক হয়ে
লিপ্ত আছি, আমাদের অভিজ্ঞতা কীটের মতোন।
জানি, সমাধান নেই; অথচ পালঙ্করাশি আছে,
রাজকুমারীরা আছে—সুনিপুণ প্রস্তরে নির্মিত
যারা বিবাহের পরে বারংবার জলে ভিজে-ভিজে
শৈবালে আবিষ্ট হয়ে সরস শ্যামল হতে পারে।
এখন তাদের রূপ কী আশ্চর্য ধবল লোহিত।
অকারণে খুঁজে ফেলা; আমি জানি নীল হাসি নেই।"[৭]

[২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২]

"কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, পরিচয় নেই; / তবুও গোপন ঘর নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে—"[৮] নিরাকার এই ব্যথার উৎস অস্বীকার করেননি কবি। তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে এর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় কাব্য *গায়ত্রীকে*-এর কবিতাগুলি সরাসরি বা কিছু পরিমার্জিত হয়ে স্থান পাচ্ছে *ফিরে এসো চাকা*-তে। *ফিরে এসো চাকা*-তে সরাসরি গায়ত্রী নেই, গায়ত্রী ঈশ্বরীর নামরূপে বদলে যাচ্ছেন। *ফিরে এসো চাকা* নিঃসন্দেহে বিনয় মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কাব্য। তবুও *ফিরে*

এসো চাকা'র তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে *আমার ঈশ্বরীকে* নামে প্রকাশিত হয়। *আমার ঈশ্বরীকে* গ্রন্থের ভূমিকায় আমার ঈশ্বরীকে সংস্করণটিকেই এই কাব্যের একমাত্র প্রামাণ্য সংস্করণ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এই কাব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বিনয়। ভূমিকায় স্পষ্টত কাব্যটি সম্পর্কে বলছেন –

> "একজন বান্ধব কেন্দ্রিক এই শুধুমাত্র প্রেমার্তির কাব্যখানি যথাযথ দিনপঞ্জি বিশেষ। তবে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রচনা করার ফলে কাব্যের অন্তর্গত সংখ্যাত প্রতিটি অংশযে-কোনো পাঠক কিম্বা পাঠিকার নিজেরই জীবনের কোনো পরিস্থির বিশ্লিষ্ট রূপায়ণে ব'লে মনে হবার কথা।"[৯]

কবির এই অকপট দাবি থেকে পাওয়া যাচ্ছে,

এক।। এটি একজন বান্ধবকেন্দ্রিক একটি প্রেমার্তির কাব্য;
দুই।। এটি 'যথাযথ দিনপঞ্জি' অর্থাৎ কাব্যটি আত্মজীবনীমূলক;

আমার ঈশ্বরীকে, ঈশ্বরীর, ঈশ্বরীর কবিতাবলী শীর্ষক নামকরণে স্পষ্টত ঈশ্বরীর আধিক্য। *অধিকন্তু*-তেও ঈশ্বরীর উপস্থিতি –

> "আমার ও ঈশ্বরীর প্রায়াবচেতনা আর অতিচেতনার
> ক্ষণিক চিন্তার ফলে, দীর্ঘস্থায়ী কামনার ফলে উভয়েই
> বস্তুকে বিলীন হতে এবং বস্তুকে জাত—আবির্ভূত হতে
> দেখেছি অনেক বার, …."[১০]

পাঠক জানেন, তাঁর *অঘ্রাণের অনুভূতিমালা*'কে, মরমী পাঠক আরও জানেন, *আমিই গণিতের শূন্য*কে। কিন্তু এর বাইরের বিনয় সাধারণত পাঠকের কাছে অজ্ঞাত, কিছু ক্ষেত্রে অনর্থও বটে। *আমাদের বাগানে, আমি এই সভায়* কাব্যের কবিতাগুলি অনেকটা এলোমেলো, বালখিল্যতায় ভরা এবং অনর্থ মাত্র মনে হয়। আপাত দৃষ্টিতে অনর্থ তো বটেই! কবি কেন লিখলেন *বাল্মীকির কবিতা*গুলি? রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হওয়ার জন্য নয় নিশ্চয়; নিশ্চয় নয় বাল্মীকির মতো মহাকবি হয়ে ওঠার বাসনায়! তাঁর মহত্তের যাবতীয় উপাদান *ফিরে এসো চাকা*'র কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। গাণিতিক তত্ত্ব-বীক্ষণে কবিতার ভাবাবেগ অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করলেন বিনয়, তিনিই কেমন যেন দুরূহ হয়ে উঠলেন বাল্মীকির ভূট্টা সিরিজের কবিতাগুলিতে। যৌনতা নিয়ে খেলতে খেলতে কখন যেন সংবেদনশীল এক প্রিয় কবি পাঠককুলে অসহনীয় হয়ে উঠলেন। আত্মনাশের এক অনবদ্য আয়োজন দেখা গেল কবির এই পাগলামিতে। এই প্রকট অপসংগতি বলতে বাধ্য হচ্ছেন, ঈশ্বরীর কবিতাগুলি ঈশ্বরীরই স্বরচিত। কখনও বলছেন, ঈশ্বরীই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। আধিভৌতিক অবচেতনায় ঈশ্বরীকে কখনও মা কালীর সঙ্গে উপমিত করছেন। এতে বোঝা যায় তিনি ভারসাম্য হারিয়েছেন বারে বারে। মানসিক চিকিৎসার কারণে তাঁকে হাসপাতালে একাধিকবার ভর্তি হতে হয়েছে। আপাত সুস্থ হয়েছেন, আবারও ঈশ্বরীর চিন্তায় নিজেকে অসুস্থ করেছেন। দূরের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থেকেই এক বিরাট বিশাল রহস্যজগৎ রচনা করেছেন সৃষ্টিসত্তার অন্তরে-অন্দরে। সেই নক্ষত্রের অনির্বাণ আঘাত শুদ্ধচেতনায় সম্পৃক্ত করেই বিনয় নিজেও এক নক্ষত্র হয়ে উঠেছেন।

যদিও তাঁর কবির অন্তিম পর্যায়ের কবিতাগুলি অ্যাবসার্ড ধরনের। এই উদ্ভটত্ব হয়তো আধুনিকতা-উত্তর একটি উপাদান হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. মজুমদার, বিনয়, ২০১৪, *কাব্য সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), 'অধিকন্তু ২২ (ক)', প্রতিভাস, কলকাতা-২, পৃ. ৮০
২. বিশ্বাস, আকাশ, ২০১২, *পঞ্চাশের প্রবণতা ও বিনয় মজুমদার*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, পৃ. ৬২
৩. মজুমদার, বিনয়, ২০১৪, *কাব্য সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), 'আত্মপরিচয়', প্রতিভাস, কলকাতা-২, পৃ. ১৫-১৬
৪. মজুমদার, বিনয়, ২০১৪, *কাব্য সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), 'ফিরে এসো চাকা', প্রতিভাস, কলকাতা-২, পৃ. ৪৭
৫. তদেব, পৃ. ৫০
৬. তদেব, পৃ. ৫০
৭. তদেব, পৃ. ৫৫
৮. তদেব, পৃ. ৬৫
৯. তদেব, পৃ. ১৩৩
১০. মজুমদার, বিনয়, ২০১৪, *কাব্য সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), 'অধিকন্তু ৬', প্রতিভাস, কলকাতা-২; পৃ. ৭৫